KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

নালন্দা ও বখতিয়ার খিলজি : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ

সায়ক কুমার দত্ত
স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র
ইতিহাস বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

সারাংশ :

আমরা সকলেই জানি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের মাটিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে বিশ্বের দরবারে এক শ্রেষ্ঠ আসনে উন্নীত করেছে। নালন্দা, ওদন্তপুরী, সোমপুরা বা বিক্রমশিলার মতো অথবা এর বাইরেও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, এমনকি বিদেশের মাটিতে জ্ঞানের প্রসারের কাজে নিযুক্ত ছিলো। কিন্তু, ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতবর্ষীয় সমাজ কিন্তু আদ্যিকাল থেকেই সংঘর্ষশীল, তা সে বহিঃশত্রুর সাথেই হোক বা নিজেদের মধ্যে। তাই, এই সাংঘর্ষিক পরিবেশের প্রভাব, প্রতিনিয়তই শিক্ষায়তনের উপরেও পরিলক্ষিত হয়েছে। ঠিক সেইরকম একটা শিক্ষায়তন ছিলো নালন্দা মহাবিহার। তবে, এই শিক্ষায়তনের ধ্বংসের বিষয়টি, আজও একটি বড়ো প্রশ্নচিহ্ন! কেন, কীভাবে, কখন, কে - এই শিক্ষায়তনের গৌরবকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করেছিলেন, তা আজও একটি বিতর্কিত বিষয়। নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাই এই বিতর্কিত বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা ও একটি সম্ভাব্য কিন্তু তর্কাতীত নয়, এমন একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ করার সর্বোত্তম চেষ্টা করা হয়েছে।

শব্দ সংকেত : নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী / উদন্তপুরী, জ্ঞাননাথ মন্দির, মিনহাজ, বিহার, তারানাথ

মূল প্রবন্ধ :

নালন্দা মহাবিহার ছিলো প্রাচীন ও আদি-মধ্যকালীন ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৌদ্ধমঠ। পাশাপাশি, এটি, প্রাচীন বিশ্বের একটি অতি জনপ্রিয় শিক্ষায়তনও বটে। গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে, ৪২৭ খৃষ্টাব্দের আশেপাশে, এটি নির্মাণ করা হয়েছিলো। আনুমানিক পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত, এটি, ভারতীয় সমাজে শিক্ষাবিস্তারের কাজ করেছিলো। এমনকি, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতগণ, এই শিক্ষায়তনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু, দ্বাদশ শতকের শেষ নাগাদ, এক তুর্কি অভিযাত্রী মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি ও তার সৈন্যদলের অস্ত্রের ঝনঝনানি, এই শিক্ষায়তনের গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দেয়। নির্বিচারে হত্যার পাশাপাশি চলে শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ! আদৌ কি তাই? ভুলে গেলে চলবে না, সময়টা কিন্তু প্রাচীন বাংলাতে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়েরও! (কেননা, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক পাল সাম্রাজ্য তখন ধরাশায়ী) অন্যদিকে আবার, বঙ্গে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন সাম্রাজ্যের অন্তিম সময়, উত্তর ভারতেও রাজপুত সাম্রাজ্য ধরাশায়ী, মুহুর্মুহু আক্রমণ ঘটছে ঐশ্লামিক তুর্কিবাহিনীর। তাই, ব্রাহ্মণ্যধর্ম-ইসলামধর্ম-বৌদ্ধধর্মের পারস্পরিক সংঘাতেরও যুগ এটি। তাই,

বখতিয়ারের অস্ত্র নাকি ধর্মীয় সংঘাত, রাজনৈতিক আগ্রাসন নাকি ধর্মীয় আক্রোশ, কোনটি নালন্দা মহাবিহারের পতনে দায়ী, তা আজও একটি বিতর্কিত বিষয়।

সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত লামা তারানাথ, তার "History Of Buddhism In India" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "রাজার মন্ত্রী কাকুৎসিদ্ধ, শ্রী নলেন্দ্রে, একটি মন্দির নির্মাণ করেন। এর পবিত্রকরণের সময়, তিনি মানুষের জন্য একটি মহান আনুষ্ঠানিক ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন সময়, দুই তীর্থিকা ভিক্ষুক, ভিক্ষা করতে আসে। যুবক দুষ্টু শ্রমণরা, তাদের দিকে আবর্জনা ছুড়ে মারে, দরজার চৌকাঠের ভিতর চেপে রাখে এবং তাদের উপর হিংস্র কুকুর ছেড়ে দেন। এই দুজন খুব রেগে যায়। তাদের একজন, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন এবং অন্যজন নিজেকে সূর্য-সাধনায় নিয়োজিত করেছিলেন। নয় বছর ধরে তিনি মাটিতে খনন করা গভীর গর্তে বসে সাধনা করেন। তবুও তিনি সিদ্ধি লাভে ব্যর্থ হন। তাই, তিনি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তখন, তার সঙ্গী জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি মন্ত্রে সিদ্ধি পেয়েছ?' তিনি বললেন, 'এখনও না।' অপরজন বললো, 'চারিদিকে দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও আমি অনেক কষ্টে তোমার জন্য জীবিকা নির্বাহ করেছি। তাই, মন্ত্র-সিদ্ধি না করে বের হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাথা কেটে ফেলবো'। এ কথা বলে তিনি একটি ধারালো ছুরিতে আঘাত করেন। এতে তিনি ভীত হয়ে পড়েন এবং তিনি আরও তিন বছর সাধনা চালিয়ে যান। এভাবে বারো বছরের প্রচেষ্টায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি যজ্ঞ করলেন এবং চারিদিকে মোহনীয় ছাই ছড়িয়ে দিলেন। এটি অবিলম্বে একটি অলৌকিকভাবে উৎপাদিত আগুনের জন্ম দিয়েছিলো। এটি চুরাশিটি মন্দির, বুদ্ধের মতবাদের কেন্দ্রগুলিকে গ্রাস করেছিলো। আগুন, শ্রী নলেন্দ্রের ধর্মগঞ্জে, বিশেষ করে রত্নসাগর, রত্নোদাধি এবং রত্নারান্দক নামক বড় মন্দিরগুলিতে, যেখানে মহাযান পিটকের সমস্ত রচনা সংরক্ষিত ছিলো, সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করে। এ সময় নয়তলা বিশিষ্ট রত্নোদাধি মন্দিরের ওপরের তলায় রাখা কিছু কাজ থেকে আগুন নেভানোর জন্য জল বের হয়। যে কাজ পর্যন্ত, এই জল পৌঁছেছে, সেগুলো অক্ষতই থেকে গেছে"।[1]

উপরিক্তো কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, প্রথমত, এখানে 'যজ্ঞের মোহনীয় ছাই' ছড়িয়ে আগুন লাগানোর কথা আছে, যেটি বর্তমানের যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই কাল্পনিক হিসাবে স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, এখানে 'দুজন তীর্থিক ভিক্ষু'-র কথা বলা হলো। বৌদ্ধধর্মে, তীর্থিক বলতে সাধারণত অ-বৌদ্ধ ধর্মদ্রোহীকে বোঝায়। পাশাপাশি, সেই দুজন তীর্থিক ভিক্ষুর কার্যকারিতা (যেমন, সূর্যসাধনা) দেখে, তাদেরকে সাধারণভাবেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বলে ধারণা করা যেতে পারে (তবে, এই সাধনার বিষয়টি যেহেতু তন্ত্র-মন্ত্র নির্ভর, সেহেতু এই তীর্থিক ভিক্ষুদের আবার বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রযান সম্প্রদায়ভুক্ত বলে করাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়)। তৃতীয়ত, সেই তীর্থিক ভিক্ষুদের দ্বারা পুস্তকাগারে, অগ্নিসংযোগের কথা বলা হলো। অর্থাৎ, নালন্দার গ্রন্থগারে অগ্নিসংযোগের ক্ষেত্রে, তারানাথ, তীর্থিক ভিক্ষু (ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী)-দের দায়ী করেন। তবে, একটি বিষয় স্বীকার্য যে, এই কাহিনীর মাধ্যমে, মহাযান গ্রন্থগুলোর মহানত্ব তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, এটাও বলা যায় যে, এই কাহিনী, সরাসরি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের, নালন্দার গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী না করলেও, সেইদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে। এই কাহিনী, তারানাথ কখনোই মনোরঞ্জনের জন্য লেখেননি। এর মাধ্যমে, তিনি, নালন্দার গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগের বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত তুলে ধরেছেন। যে দুজন তীর্থিক ভিক্ষু, 'যজ্ঞের মোহনীয় ছাই' ছড়িয়ে আগুন লাগালেন, তাদেরকে, কোনো বৌদ্ধশ্রমণ আটকানোর চেষ্টা করলেন না কেন? কেননা, তারা অতর্কিতে এই ঘটনা ঘটান এবং যার ফলে, বৌদ্ধরা হতচকিত হয়ে পড়েন। কিন্তু, মাত্র দু'জনের, এই ধরনের কর্মকাণ্ডে, পুরো নালন্দার সকল বৌদ্ধরা, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন! এমনই ভয়ংকরভাবে ছত্রভঙ্গ হলেন যে, কোনো ভিক্ষুই, এদের দুজনকে (তখন তারা অপরাধী) ধরার চেষ্টা করলেন না! বা, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া বা পাল্টা আক্রমণের চেষ্টাও করেননি! এই ধারণাও গ্রহণযোগ্য না। বলা যায়, তারানাথ কিন্তু এই বিষয়ে নীরব।

লামা তারানাথ, তাঁর একই গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "তারপর, তুরুস্ক রাজা, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অন্তর্রাবেদী অঞ্চলে চাঁদকে ডেকে আনলেন। কিছু ভিক্ষু এই রাজার জন্য বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করেছিলো। ফলস্বরূপ, ভামগালা এবং অন্যান্য স্থানের ক্ষুদ্র তুরুস্কা শাসকরা একত্রিত হয়ে সমগ্র মগধ জুড়ে কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং ওদন্তপুরীতে বহু নিযুক্ত সন্ন্যাসীকে হত্যা করে। তারা, এটি এবং বিক্রমশিলাকেও ধ্বংস করেছিলো"।[2]

লামা তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত উপরোক্ত কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিক্রমশীলা ও উদন্তপুরী মহাবিহারে, তুরস্ক রাজার ধ্বংসযজ্ঞের সাথে, বৌদ্ধ সংযোগ আছে। লামা তারানাথ বলছেন, 'চন্দ্রকে ডাকলেন'। এই 'চন্দ্র' শব্দটির সাথে বৌদ্ধভিক্ষু চন্দ্রাকীর্তি বা চন্দ্রগোমিনের সম্পর্ক আছে। কিন্তু, দুজনেই, মহম্মদ বখতিয়ারের অনেক অনেক পূর্বেকার (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী), সমসাময়িক বৌদ্ধ পণ্ডিত নন। কিন্তু, বৌদ্ধ সংযোগ যে তুরস্কীয় রাজার সঙ্গে ছিলো, তার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন। এমনকি, অনেক ভিক্ষু যে 'রাজার হয়ে বার্তাবাহকের কাজ' করে, সেটাও তুলে ধরছেন তিনি। সর্বোপরি, তুরস্ক বাহিনীর দ্বারা বৌদ্ধমঠের ধ্বংসের তালিকায় উদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা থাকলেও, নালন্দা মহাবিহারের উল্লেখ কিন্তু সেই তালিকায় নেই। তাই, মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির দ্বারা যে নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হয়েছিলো বা তার গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ হয়েছিলো, এমন উল্লেখও কিন্তু তারানাথের লেখাতে নেই।

তারানাথের একই গ্রন্থেই তিনি লিখছেন, "ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশিলাকে রক্ষা করার জন্য, রাজা, এগুলিকে আংশিকভাবে দুর্গে রূপান্তরিত করে, সৈন্য স্থাপন করেছিলেন"।[3] স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, 'উদন্তপুরী ও বিক্রমশিলাকে রক্ষার জন্য, সেগুলোকে আংশিকভাবে দুর্গে পরিণত করা' হলেও, উপরোক্ত তালিকায় নালন্দার উল্লেখ নেই কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কি নালন্দাকে রক্ষার জন্য রাজার তরফে কোনো চেষ্টাই হয়নি? যদি না চেষ্টাই হয়, তাহলে কেন? মনে রাখতে হবে, বখতিয়ারের দ্বারা নালন্দার ধ্বংসসাধন ঘটার কথা বলা হয় দ্বাদশ শতকের শেষদিকে। বঙ্গে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাদের শাসন। আর, সেন রাজারা কখনোই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, তাহলে কেন উদন্তপুরী ও বিক্রমশিলাকে, রক্ষার চেষ্টা হলো, নালন্দার নয়? মনে রাখতে হবে, উদন্তপুরী, বিক্রমশিলা বা নালন্দা প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারের গুরুত্ব অনেক বেশী হলেও, নালন্দার গুরুত্ব কিন্তু অন্যতম উচ্চতর এক পর্যায়ে ছিলো। তাহলে কি বখতিয়ারের দ্বারা পরোক্ষভাবে, নিজের (ব্রাহ্মণ্যধর্মের) স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নালন্দাকে ধ্বংস করা হলো?, এই প্রশ্ন ওঠাও কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে, বখতিয়ার খিলজির দ্বারা 'বিহার দুর্গ' (যেটিকে পরে উদন্তপুরী বিহার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে) আক্রান্ত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। তবে, গ্রন্থাগারে, অগ্নিসংযোগের উল্লেখ নেই। উপরন্তু, আক্রমণকারীদের দ্বারা উক্ত বিহারে থাকা পুস্তকের মর্মোদ্ধার করে, উক্ত 'বিহার দুর্গ'-এর চরিত্র নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। এবং, 'বিহার দুর্গ' জয়লাভের পর, বখতিয়ার, দিল্লীশ্বর কুতুবুদ্দিন আইবকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন বলেও উল্লিখিত আছে এই গ্রন্থে (এই তথ্যটি, হাসান নিজামীর 'তাজ-উল-মাসির' গ্রন্থের দ্বারাও সমর্থিত)।

আবার, ডি আর পাতিল রচিত 'The Antiquarian Remains in Bihar' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, "... নালন্দার চূড়ান্ত ধ্বংস, এখনোও একটি রহস্য, উন্মোচন করা সম্ভব নয়। বক্তিয়ার খিলজির অধীনে, মহম্মদীয়দের দ্বারা, ধ্বংসের কোনোও সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই..."-এই কথাটি।[4]

এই গ্রন্থেই পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে, "এই খারাপ দিনের মধ্যেই, সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে, বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে মুহম্মদীয়দের কাছ থেকে একটি চূড়ান্ত আঘাত এসেছিলো, যেখানে বলা হয়, পশ্চিম

বিহারের একটি মহান শহরকে ধ্বংস করেছিলো, তখন বিহার (সংস্কৃতে 'ভিহারা') নামে ডাকা হয়, যা, মহম্মদীয়দের মতে, এটি একটি অধ্যয়নের জায়গা ছিলো। আক্রমণকারীরা সম্ভবত নালন্দার নাম জানত না, যা সাধারণত তাদের ধ্বংসের উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা নির্দেশিত বলে মনে করা হয়, এটি ঘটেছিলো ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে এবং আরও বলা হয় যে, এই কয়েকটি আঘাতের পরেও নালন্দা, বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করেছিলো আরো কিছুদিন;কিন্তু সামান্য জন সমর্থন এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা চলে যাওয়ায়, এটি অবশ্যই একটি সীমিত সময়ের জন্য একটি অপ্রীতিকর অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলো। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, কোনোও মুহম্মদ মখদুম, পীর বা মহান খ্যাতিসম্পন্ন সাধক, তাদের সমাধি বা মসজিদের সাথে, নালন্দা ঢিবির চূড়াগুলিকে বিভূষিত করতে পারেননি। এটি একটি বৈশিষ্ট্য, যা লক্ষ করা উচিত, সাধারণত সারা বিহার জুড়ে পালিত এবং গুরুত্বপূর্ণ জীবন্ত অভয়ারণ্যের স্থানে পরিলক্ষিত হয়, যা এই ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য মুসলিম আক্রমণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। খোদ বিহার শরীফে, এ ধরনের অনেক মুসলিম নিদর্শন এখনও বিদ্যমান;কিন্তু ছয় বা সাত মাইল দূরে নালন্দায় তাদের অনুপস্থিতি বরং আশ্চর্যজনক। ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের সময় যদি নালন্দা অত্যন্ত সুনাম বা গুরুত্বের একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকত, তাহলে আমাদের আশা করা উচিত যে, ঘটনাটির মুসলিম ইতিহাস নালন্দার নাম জানতো এবং উল্লেখ করতো। আক্রমণকারীর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটিকে একটি মহান শহর এবং অধ্যয়নের স্থান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেটি পরে 'বিহার' বলে পরিচিত হয়, যা আরও উপযুক্তভাবে আধুনিক বিহার শরীফের উল্লেখ হবে, যেখানে একটি মঠও ছিলো এবং নালন্দায় নয়, যেটির কাছাকাছি এই নামের, কোনো বড় শহর ছিল না। জানা যায়, পাল শাসকদের মধ্যে একজন ওদন্তপুরী বা বিহার শরীফে নিজেই একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন, যা নালন্দার ভাগ্যকে বিরূপ প্রভাবিত করেছিলো। এই সমস্ত পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের বেশ আগে, নালন্দা সম্ভবত ইতিমধ্যেই ক্ষয় বা ধ্বংসস্তূপে পড়েছিলো;কিন্তু কিভাবে এবং কখন আসলে এই ঘটনাটি ঘটে, এখনও একটি রহস্য, উন্মোচন করা সম্ভব নয়"।[5]

উপরের দ্বিতীয় ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশ কয়েকটা জায়গাতে 'মনে করা'-র কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, ব্যক্তিগত মনে করার উপর, ইতিহাস নির্ভরশীল না। ইতিহাসে দরকার হয় অকাট্য প্রমাণের, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের নয়। তবে এখানে, প্রথমত, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা চলে যাওয়ার প্রতি, নির্দেশ করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত, নালন্দাতে, নালন্দার ঢিবির অনুরূপ কোনো ঐশ্লামিক নিদর্শনের অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে, যে ধরনের ঐশ্লামিক প্রভাবান্বিত ঢিবি, বিহার শরীফে পরিলক্ষিত হয়েছে (নালন্দাতে বহিরাগত ঐশ্লামিক আক্রমণের ঘটনা কি তাহলে ঘটেনি? – এমন প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক কিছুই নয়), তৃতীয়ত, বিহার শরীফ বা উদন্তপুরী বিহারে আক্রমণের উল্লেখের পাশাপাশি উদন্তপুরীতে পালরাজা কর্তৃক বৌদ্ধমঠ স্থাপনের ফলে নালন্দার ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষণীয়।

হাসমুখ সাঙ্খালিয়া রচিত 'The University Of Nalanda' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "মুসলিম ইতিহাসকাররা, আমাদের বলে যে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ এতটাই মারাত্মক এবং এতটাই পুঙ্খানুপুঙ্খ ছিলো যে, সন্ন্যাসীরা (মাথা মুণ্ডন করা ব্রাহ্মণ) একজন একজন করে এবং সবাই মারা গিয়েছিলো যে, বইগুলির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য, কেউ অবশিষ্ট ছিলো না, যে বইগুলো, ওই জায়গায় পেয়েছিলেন বিজয়ীরা"।[6]

উপরিক্তো তথ্যটির, যে তথ্যসূত্রটি (হেনরি ইলিওটের 'ভারতের ইতিহাস:দ্বিতীয় খণ্ড), লেখক প্রদান করেছেন, সেই তথ্যাসূত্রানুসারে উল্লিখিত আছে, "fort of Behar" শব্দটি, যেটি 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থানুসারে, উদন্তপুর বিহার বলে উল্লিখিত হয়েছে। গবেষক সাঙ্খালিয়া, তার গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে (অধ্যায়টির নাম "The

End Of Nalanda"), যে তথ্য (উপরোল্লিখিত) প্রদান করছেন নালন্দা ধ্বংসের বিষয়ে, তার সঙ্গে গবেষক প্রদত্ত তথ্যসূত্রের দ্বারা উদ্ঘাটিত তথ্যের মধ্যে, মিলের অভাব বর্তমান।

আমরা যদি, গবেষক হেনরি ইলিওট রচিত 'ভারতের ইতিহাস:দ্বিতীয় খণ্ড' গ্রন্থটি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, সেখানেও 'তবকাত-ই-নাসিরী'-র অনুরূপ কাহিনীই বর্ণিত। এবং, এই বিজয়ের পরে, দিল্লীশ্বর কুতুবুদ্দিন আইবকের সাথে বখতিয়ারের সাক্ষাৎকারের কথাও বর্ণিত আছে।

শরতচন্দ্র দাস রচিত "Antiquity Of Chittagong" গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, "১২০০ খ্রিস্টাব্দে, কাকমিরের পণ্ডিত শাক্য শ্রীভদ্র, ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশিলার, মহান মঠ পরিদর্শন করেন। তিনি তুরুস্কা (মুহাম্মদীয়) সেনাবাহিনীর দ্বারা, সেই বিহারগুলির ধ্বংস এবং ভিক্ষুদের বড়োমাত্রায় গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন"।[7] একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই ধ্বংসের তালিকায় কিন্তু নালন্দার উল্লেখ নেই, আছে শুধুমাত্র বিক্রমশিলা ও উদন্তপুরী মহাবিহারের। মুহাম্মদীয় শক্তির দ্বারা, এই দুই মহাবিহারের ধ্বংসের বিষয়টি, লামা তারানাথের গ্রন্থের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে।

এবারে একটু অন্য হিসাবে আসা যাক। সাধারণত বলা হয়ে থাকে, "১১৯৩ সাল নাগাদ, বৌদ্ধদের নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস করা হয়েছিলো"।[8] অন্যদিকে আবার, শরতচন্দ্র দাসের গ্রন্থানুসারে, ১২০০ খৃষ্টাব্দ (বা তারপর)-এ উদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা, আক্রমণ হচ্ছে বখতিয়ার খিলজির দ্বারা। যদি সত্যিই, ১১৯৩ সালে, বখতিয়ার খিলজির দ্বারা নালন্দার ধ্বংসসাধন ঘটে থাকে, তাহলে ১১৯৩ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বখতিয়ার খিলজির উল্লেখ কোথায়? এই মধ্যবর্তী সময়ে বখতিয়ার নিছক হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন, এমন ধারণাও সঠিক নয়। আবার, পরবর্তী সময়ে অভিযান চালানোর জন্য সেনাবাহিনী সংগ্রহ ও সজ্জিতকরণের কাজে নিমগ্ন ছিলেন-এটির সমর্থনেও কোনো প্রমাণ নেই।

সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব" গ্রন্থে, মিনহাজ-উদ্দিন সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। সেখানে, বখতিয়ার আক্রান্ত বিহারের নাম বা তার প্রকৃতি বা জয়লাভের পর দিল্লীশ্বরের সাথে সাক্ষাৎকারের কথাও বলা হয়েছে।

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "ভারতে ইসলাম ভারতীয় মুসলিম" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যটি, মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত। আবার, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই গ্রন্থেরই অন্য একটি স্থানে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়, বৌদ্ধধর্মের প্রতি হিন্দুধর্মের আক্রোশ এবং হিন্দু শাসনকালে (ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাসনকাল) রাজানুকূল্যের অভাব, নালন্দার সর্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধ্বসের কারণ।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে, আরোও অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। উক্ত গ্রন্থে, ১১০০ সালে, বখতিয়ারের দ্বারা নালন্দা ধ্বংসের কথা উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গত বলা ভালো, দুর্ভাগ্যক্রমে বখতিয়ার তখন জন্মগ্রহণ করেননি। ফলে, এই তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা একেবারেই শূন্য। আবার, এই গ্রন্থের মধ্যেই উল্লেখ আছে যে, সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে, বখতিয়ার কখনোও, নালন্দার ধারেকাছে যাননি। তবে, অধ্যাপক মহাশয়, তার এই তথ্যের, কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি, যার ফলেই কার্যত এই তথ্যটিও নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে। তবে, তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে, মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ, নালন্দা ধ্বংসের উল্লেখ করেননি বলে, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, যেটি মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজের গ্রন্থটি দেখলে প্রমাণিত হবে। এছাড়া, আরোও একটি জায়গাতে, লামা তারানাথের অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, উগ্র হিন্দুরা (তিব্বতীয় শাস্ত্র 'পাগসাম ইয়ং জাং' অনুসারে) ও শৈবরা (ডি আর পাতিলের মতে), নালন্দার গ্রন্থাগার পুড়িয়েছে। তবে, নালন্দার উপর একবার নয়, আঘাত হানা হয়েছিলো একাধিকবার, তা সমর্থিত হয়েছে অধ্যাপক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ দ্বারা। এমনকি, অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "ইসামি রচিত 'ফুতুহ-উস-সালাতিন' ও হাসান নিজামী রচিত 'তাজুল-মাসির' গ্রন্থেও নালন্দা অভিযানের কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই"।[9] সর্বোপরি, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা, বখতিয়ার কর্তৃক উদন্তপুরী মহাবিহারের ধ্বংসের বিষয়টির ওপরে প্রশ্নচিহ্ন দেওয়া হলেও, বখতিয়ার কর্তৃক উদন্তপুরী মহাবিহারের ধ্বংসের বিষয়টি লামা তারানাথ, মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ প্রমুখ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

আবার, ডঃ জি রোয়েরিখ রচিত "Biography of Dharmasvamin" গ্রন্থের শুরুতে বেশ কিছু তথ্য উপস্থিত। সেখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, ধর্মস্বামীর রচনা থেকে, ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে, নালন্দার ধ্বংসসাধনের বিষয়ে, নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে, সেখানকার মন্দির বা অনেকগুলো মঠ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো মুসলিমদের দ্বারা, তা বলা হয়েছে। আবার, মুসলিম অভিযানে নালন্দার রক্ষাকর্তা "জ্ঞাননাথ"-এর মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে, সেখানে, সরাসরি নালন্দা মহাবিহারের উপর আক্রমণের কথা বলা হয়নি। কিন্তু, নালন্দার উপর আক্রমণের আগে যে মুসলিম সৈন্যরা ভয় পেয়েছিলো, তার উল্লেখ আছে। তাহলে কি জ্ঞাননাথ মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকেই, নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসের সমতুল্য বলা হয়েছে?-এমন প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে, জ্ঞাননাথ মন্দির ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। এবং, এই ধ্বংসযজ্ঞ, মুসলিমদের আগেকার আক্রমণ দ্বারা সাধিত হয়েছে বলেও উল্লিখিত আছে অধ্যাপক রোয়েরিখের বইতে। পরবর্তী আক্রমণের আগে (নালন্দা মহাবিহারের উপর), মুসলিমরা ভয় পেয়েছিলো বলে উল্লিখিত। অর্থাৎ, Nalanda Complex (নালন্দা মহাবিহার, জ্ঞাননাথ মন্দির বা অন্যান্য মন্দির-মঠ)-এর আংশিক টিকে থাকা, মুসলিমদের কুসংস্কারজনিত ভয়ের কারণে বলে উল্লিখিত আছে। যদিও, সরাসরি নালন্দা মহাবিহারের উপর আক্রমণের উল্লেখ নেই।

জি রোয়েরিখের গ্রন্থের দশম অধ্যায় দেখলে, বেশ কিছু বিষয় সামনে উঠে আসবে। সেখানে, বেশ কিছু শিখর, বিহার প্রভৃতি তুরস্কীয়দের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রোয়েরিখের বইতেই, শুরুতে, মুসলিমদের দ্বারা বড়ো-ছোটো মঠ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা হলেও, সেই তালিকায় নালন্দা মহাবিহারের উল্লেখ নেই। ওই গ্রন্থেই মন্দিরের পাথরসমূহ, তুরস্কীয়দের দ্বারা সরানোর কথা বলা হয়েছে, যেটিও ওই গ্রন্থেরই ভূমিকাংশ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, যেখানে ওই মন্দিরের নাম 'জ্ঞাননাথ মন্দির' বলে উল্লিখিত। এমনকি, ওই গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, নালন্দায়, তুরস্কীয় সৈন্যদের হাজির হওয়া ও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা। তবে, শেষ পর্যন্ত, তাদের ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, জ্ঞাননাথ মন্দিরে অভিযানের পর, নালন্দায় বড়োধরনের তুরস্কীয় আক্রমণ ঘটেনি। তাই, পরিশেষে বলা যায় যে, বখতিয়ার খিলজির দ্বারা নালন্দা মহাবিহারে, ব্যাপক ধরনের আক্রমণ ও ধ্বংসের কথা, রোয়েরিখের গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত না। এমনকি, ধর্মস্বামীর লেখা দ্বারা নালন্দার গ্রন্থাগারে তুরস্কীয়দের দ্বারা অগ্নিসংযোগের বিষয়টিও সমর্থিত না। বখতিয়ার খিলজি, নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস করেন বা এর গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করেন, এই বিষয়ে ধর্মস্বামী নীরব। তার গ্রন্থ থেকে, উপরোক্ত বিষয়ে তেমন কিছুই পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে, নালন্দার জ্ঞাননাথ মন্দিরের ওপর তুরস্কীয় আক্রমণের বিষয়ে জানতে পারি।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত "বাঙ্গলার ইতিহাস" গ্রন্থে বেশ কয়েকটি তথ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখানে, তারানাথের অনুরূপ ঘটনার পাশাপাশি, নালন্দা মহাবিহারের গ্রন্থাগারের, কয়েকবার বিধ্বস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, আর্থিক সাহায্যের অভাবের কথাও বলা হয়েছে।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রচিত "মধ্যকালীন ভারত (প্রথম খণ্ড)"-এ, দু'শো ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে 'a fort in Bihar'-এ আক্রমণ-এর কথা বলা হয়েছে। এবং, সেই বিহারের নাম হিসাবে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র, নালন্দার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, তবকাত-ই-নাসিরী অনুসারে, দু'শো ঘোড়সওয়ার নিয়ে আক্রমণ, উদন্তপুরী মহাবিহারে হয়েছিলো। ফলে, অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের এই বক্তব্যটি, প্রায় সমকালীন তথ্যসূত্র (যদিও মিনহাজের গ্রন্থটির এই অভিযানের ঘটনা, মিনহাজ প্রায় ৪০ বছর পর এক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন) দ্বারা সমর্থিত নয়।

ডঃ বুদ্ধ প্রকাশ রচিত "Aspects of Indian History and Civilization" গ্রন্থে, নালন্দায়, তুরস্কীয়দের বহিরাক্রমণের কথা বলা হলো। কিন্তু, পাশাপাশি, এটাও বলা হলো, এই আক্রমণের পর, সেখানকার মন্দির-চৈত্যসমূহকে পুনর্গঠন করেছেন মহাজ্ঞানী মুদিতভদ্র। একটা কথা পরিষ্কার যে, এই আক্রমণের ফলে, নালন্দার, মন্দির-চৈত্যসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তবে, যদি সত্যিই, তুরস্কীয়দের আক্রমণের পর, মন্দির-চৈত্যসমূহকে পুনর্গঠন করা হয়, তাহলে, আদৌ কি আক্রমণ নালন্দার গ্রন্থাগারের উপরেও হয়েছিলো?-এই প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। যদি সত্যিই, নালন্দার গ্রন্থাগারের উপর আক্রমণ, এই সময় হয়, তাহলে, সেটির পুনর্গঠনের উল্লেখ কই? সেটি কি আগে পুনর্গঠন করা উচিত ছিলো না? এই প্রশ্নগুলোও স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। তবে, মন্দির-মঠের উপর তুরস্কীয়দের আক্রমণের কথাটি, অধ্যাপক জি রোয়েরিখের বইতেই উল্লেখ আছে। তাই, আদৌ এইসময় তুরস্কীয়দের বহিরাক্রমণের জন্য, নালন্দার গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো কিনা, তা স্পষ্ট নয় এই বই (ডঃ বুদ্ধ প্রকাশের বই) থেকে। তবে, ডঃ বুদ্ধ প্রকাশের গ্রন্থে, লামা তারানাথের অনুরূপ ঘটনার উল্লেখের পাশাপাশি, ধর্মগুরুদের, পারস্পরিক সংঘাতেরও কথাও বলা হয়েছে। এমনকি, মহামোহপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ রচিত "ভারতীয় যুক্তির মধ্যকালীন গোষ্ঠীর ইতিহাস" ও "ভারতীয় যুক্তির ইতিহাস" নামক দুটি গ্রন্থেও, ডঃ বুদ্ধ প্রকাশের গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার, অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে।

ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ রচিত 'ভারতে মুসলিম শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে, ২০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে, ১১৯৭ সালে, আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। যিনি ১১৯৭ সালে সংগঠিত আক্রমণ করছেন, তিনিই ১১৯৩ সালে (সাধারণত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসের সময় হিসাবে এটাই মনে করেন অধিকাংশ ঐতিহাসিক) আক্রমণ অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু, ১১৯৩ ও ১১৯৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, বখতিয়ার খিলজির উল্লেখ কোথায়!-এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। তাছাড়া, ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে আক্রমণ উদন্তপুরী মহাবিহারে হয়েছিলো, যেটি মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজের গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত। উদন্তপুরী মহাবিহারের আক্রমণ আবার ১২০০ খৃষ্টাব্দ বা তার পরবর্তীকালের ঘটনা (শরতচন্দ্র দাস দেখতে হবে)। কিন্তু, ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ এই সময়টা বলছেন ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ! উদন্তপুরী মহাবিহারে আক্রমণের সময়কালটা তিনি প্রায় তিন বছর পিছিয়ে দিচ্ছেন! প্রশ্ন উঠবে-কোনটি সঠিক!? এমনকি, অধ্যাপক অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে ইসলাম ভারতীয় মুসলিম' গ্রন্থেও, উদন্তপুরী মহাবিহারের ধ্বংসের সময়কাল নিয়ে নানা বিদগ্ধজনের নানা মতামত উপস্থিত আছে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)" নামক গ্রন্থে, বিহারের পাটনা জেলার বৌদ্ধ মঠে, আক্রমণের উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নালন্দা মহাবিহারটি, নালন্দা জেলা (যেটি পাটনা জেলা থেকে প্রায় ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত)-তে অবস্থিত।

অর্থাৎ, উপরিক্তো তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করার ফলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংঘাত বা রাজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার, ধর্মগুরুদের পারস্পরিক সংঘাতেরও বিষয়টাও উঠে আসছে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে এমন তথ্যও উঠে আসছে যে, বিষয়টার পরিষ্কার কোনো উল্লেখ নেই। আবার, অনেক জায়গাতে ঐশ্লামিক অভিযানের উল্লেখ থাকলেও, সরাসরি নালন্দার উপরে

নয় বলেই উল্লিখিত। এমনকি, সরাসরি নালন্দার উপরে তুরস্কীয় আক্রমণের উল্লেখ থাকলেও, যে তথ্যসূত্র থেকে তথ্যটি সংগৃহীত, সেটি আবার অন্য কথা বলছে - এমন ঘটনাও দেখা গেছে। তবে, একটি কথা স্বীকার্য যে, কোনো তথ্যসূত্রতেই কিন্তু সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি যে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের ফলেই নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হয়েছিলো। আবার, এটাও উল্লেখ সরাসরি নেই যে, বখতিয়ার খিলজি, নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসের জন্য দায়ী নন। তবে, বেশিরভাগ তথ্যসূত্র যে তথ্য প্রদান করছে, তাতে করে বলা যায়, বখতিয়ার খিলজির দ্বারা যে নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হয়নি, সেই দিকটি পরোক্ষভাবে নির্দেশিত হচ্ছে।

তবে, চূড়ান্ত মতামত প্রদানের পূর্বে, এই বিষয়ে এখনো ব্যাপকতর নিরপেক্ষ গবেষণার প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন, এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও, ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে, আজও কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবল। ফলে, এই post modern age-এ, ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়েও কি এই সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করা সম্ভব!? - এই আশঙ্কাও কিন্তু অমূলক নয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ কৃষাণু নস্কর স্যারের নিকট। কেননা, তিনি, কীভাবে বিভিন্ন তথ্যসূত্রকে ব্যবহার করতে হবে, তার উপযুক্ত পথনির্দেশ করেছেন। এমনকি, বিভিন্ন তথ্যসূত্র হদিশ দেওয়ার জন্য, আমি অন্তর্জালিক মাধ্যম "The Sword Of The Truth"-এর কাছেও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূত্র:

1. Taranath's History Of Buddhism In India;Translated from Tibetan by Lama Chimpa and Alaka Chattapadhyay; Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, Delhi;Reprinted : Delhi, 1990;PP – 141, 142
2. Taranath's History Of Buddhism In India;Translated from Tibetan by Lama Chimpa and Alaka Chattapadhyay; Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, Delhi;Reprinted : Delhi, 1990;P – 319
3. Taranath's History Of Buddhism In India;Translated from Tibetan by Lama Chimpa and Alaka Chattapadhyay; Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, Delhi;Reprinted : Delhi, 1990;P – 318
4. Patil, DR; The Antiquarian Remains In Bihar;Published by Prof SH Askari, MA, Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, Patna;1963;P – 324
5. Patil, DR; The Antiquarian Remains In Bihar;Published by Prof SH Askari, MA, Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, Patna;1963;P – 304
6. Sankalia, HD; The University Of Nalanda;Madras, BG Paul & Company Publishers, 12, Francis Joseph Street;1934;P – 207
7. Das, SC; Antiquity Of Chittagong;1898;P – 25
8. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ; ভারতে ইসলাম ভারতীয় মুসলিম;Bengali EBook dot Com;2022;পৃষ্ঠা – ২৬৪
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ; ভারতে ইসলাম ভারতীয় মুসলিম;Bengali EBook dot Com;2022;পৃষ্ঠা – ২৬৮